আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

ড. নাসের ইবন আবদুল করীম আল-আকল

অনুবাদক:

আবু সালমান মুহা. মুতিউল ইসলাম ইবন আলী আহমাদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة

(باللغة البنغالية)

د/ ناصر بن عبد الكريم العقل

ترجمة: أبو سلمان محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি: এ কিতাবে সালাফে সালেহীনের আকীদা ও সে আকীদার মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামগণের ব্যবহৃত শব্দের প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সমস্ত বিপর্যয় ও কু-কীর্তি থেকে রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তার কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

এই বইটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমার অসংখ্য ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের আবেদনে পুস্তিকাটি লিখতে ও প্রচার করতে প্রায়াসী হই। বইটিতে আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের আকীদা-বিশ্বাস ও এর প্রকৃত অবস্থা, সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

বইটি লেখার সময় বিশেষভাবে আমি যে বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি তাহলো শরী‘আতসম্মত ভাষা ও পরিভাষার প্রয়োগ, যা বর্ণিত হয়েছে আমাদের সম্মানিত ইমামগণেদের নিকট থেকে, আর এজন্যই আমি আমার আলোচনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, প্রমাণপঞ্জি বা অন্যের উদ্ধৃতি উপস্থাপন কিংবা কোনো কথার ওপর টীকা লেখার পথ পরিহার করেছি, যদিও তা ছিল অপরিহার্য। এর আরেকটি কারণ আমার ইচ্ছাও ছিল যে, বইটির কলেবর বৃদ্ধি না করে অল্প খরচে ও সহজভাবে এটিকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া।

আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের এটি একটি সার সংক্ষেপ মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো পূর্ণ কলেবর বইয়ের মাধ্যমে এই পুস্তিকার অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদান করা যাবে।

গুরুত্ব যাচাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত উলামা ও মাশাইখগণের সমীপে আমি বইটি উপস্থাপন করি।

১. আশ-শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাছের আল-বাররাক, ২. আশ-শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান, ৩. ড. হামযা ইবন হুসাইন আল-ফেয়ের ও ৪. ড. সফর

ইবন আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালী বইটি পড়ে তারা অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাদের মতামত পেশ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টীকা সংযোজন করেন।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে একান্ত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। দুরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী ও পরিবার-পরিজনের ওপর।

ড. নাসের ইবন আব্দুল করীম আল-আকল

৩/৯/১৪১১ হিজরী

মুখবন্ধ

আকীদার অর্থ

আভিধানিক দিক থেকে আকীদা শব্দটি উৎকলিত হয়েছে, আল-আকদু, আতাওসীকু, আল-ইহকামু বা দৃঢ় করে বাঁধা বুঝানোর অর্থে।

পরিভাষায় আকীদা বলতে বুঝায়: এমন সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে যাতে বিশ্বাসকারীর নিকট কোনো সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে না।

তাহলে ইসলামী আকীদা বলতে বুঝায় : মহান আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান বিশ্বাস রাখা, অনিবার্য করণেই আল্লাহর একত্ববাদ[1] ও তাঁর আনুগত্যকে মেনে নেওয়া এবং ফিরিশতা, আসমানী কিতাবসমুহ, সকল রাসূল, কিয়ামত দিবস, তাকদীদের ভালো-মন্দ, কুরআন হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল গায়েবী বিষয় এবং যাবতীয়

---

[1] তন্মধ্যে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ও তাওহীদুর উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদ অন্যতম।

সংবাদ, অকাট্যভাবে প্রমাণিত সকল তত্ত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।

পূর্বসুরী বা সালফে সালেহীন:

সালফে সালেহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন সোনালী যুগের লোকদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও আমাদের সম্মানিত হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণ।

আর তাদের অনুসরণকারী এবং তাদের পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের প্রতি সম্বোধন করত সালাফী বলা হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অনুসারী এবং তাঁর সুন্নাতের অনুগত এবং তাদেরকে আল-জামা‘আত বলা হয় এই মর্মে যে, তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হন নি, এছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরী

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ একমত হয়েছেন তারা তাঁর অনুসরণ করে, তাই এ সমস্ত কারণেই তাদেরকে আল-জামা'আত বলা হয়।

এছাড়া রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনো তাদেরকে আহলে হাদীস, কখনো আহলুল আসার, কখনো অনুকরণকারী দল বা সাহায্যপ্রাপ্ত ও সফলতা লাভকারী দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণের মূল উৎস এবং উহার প্রমাণপঞ্জি উপস্থাপনের পদ্ধতি

১. ইসলামী আকীদা গ্রহণের মূল উৎস কুরআনে করীম, সহীহ হাদীস ও সালফে-সালেহীনের ইজমা।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব, এমনকি তা যদি খবরে আহাদও হয়।[2]

৩. কুরআন-সুন্নাহ বুঝার প্রধান উপাদান, কুরআন সুন্নারই অন্যান্য পাঠ, যার মধ্যে রয়েছে অপর আয়াত বা হাদীসের স্পষ্ট ব্যাখ্যা, এছাড়া আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং আমাদের সম্মানিত ইমামগণ প্রদত্ত ব্যাখ্যা। আর আরবদের ভাষায় যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। তবে ভাষাগত দিক থেকে অন্য কোনো অর্থের বম্ভাবনা থাকলেও সাহাবী, তাবেঈনের ব্যাখ্যার বিপরীত কোনো

---

[2] খবরে আহাদ ঐ হাদীসকে বলে, যে হাদীস পরস্পরায় অসংখ্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় নি।

ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না। সম্ভাব্য কোনো অর্থ এর বিপরীত কোনো অর্থ বহন করলেও তাদের ব্যাখ্যার ওপরেই অটল থাকতে হবে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের মূল বিষয়বস্তুসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। এজন্য দীনের মধ্যে নতুন করে কোনো কিছু সংযোজন করার কারও অধিকার নেই।

৫. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে আত্মসমর্পন করা। সুতরাং নিজের মানসিক ঝোঁক বা ধারণার বশঃবর্তী হয়ে, আবেগপ্রবণ হয়ে অথবা বুদ্ধির জোরে বা যুক্তি দিয়ে কিংবা কাশফ অথবা কোনো পীর-উস্তাদের কথা, কোনো ইমামের উক্তির অজুহাত দিয়ে কুরআন সুন্নাহ'র কোনো কিছুর বিরোধিতা করা যাবে না।

৬. কুরআন, সুন্নাহ'র সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের কোনো সংঘাত বা বিরোধ নেই। কিন্তু কোনো সময় যদি উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় এমতাবস্থায় কুরআন সুন্নাহ'র অর্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে শরী‘আতসম্মত ভাষাও শব্দ প্রয়োগ করা এবং বিদ‘আতী পরিভাষাসমূহ বর্জন করা আর সংক্ষেপে বর্ণিত শব্দ বাক্য বা বিষয়সমূহ যা বুঝতে ভুল-শুদ্ধ উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে, এমতাবস্থায় বক্তা থেকে ঐ সমস্ত বাক্য বা শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া, তারপর তন্মধ্যে যা হক বা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে তা শরী‘আত সমর্থিত শব্দের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হবে, আর যা বাতিল তা বর্জন করতে হবে।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ, ভ্রুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। আর সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মাহও ভ্রান্তির উপরে একত্রিত হওয়া থেকে মুক্ত। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত) এ উম্মতের কেউই নিষ্পাপ নন।

আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এবং অন্যান্যরা যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন, সে সমস্ত বিষয়ের সূরাহার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ’র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তবে উম্মতের মুজতাহিদগণের যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হবে

সেগুলোর জন্য সঙ্গত ওযর ছিল বলে ধরে নিতে হবে। (অর্থাৎ ইজতিহাদী ভুলের কারণে তাদের মর্যাদা সমুন্নতই থাকবে এবং তাদের প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ করতে হবে।)

৯. এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ ও ইলহামপ্রাপ্ত অনেক মনীষী রয়েছেন। সুস্বপ্ন সত্য এবং তা নবুওয়াতের একাংশ। সত্য-সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাণী সত্য এবং তা শরী'আত সম্মতভাবে কারামত বা সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি ইসলামী আকীদা বা শরী'আত প্রবর্তনের কোনো উৎস নয়।

১০. দীনের কোনো বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয়।

তবে উত্তম পন্থায় বিতর্ক বৈধ। আর যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে শরী'আত নিষেধ করেছে, তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। এমনিভাবে অজানা বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়াও মুসলিমদের জন্য অনুচিৎ, বরং ঐ অজানা বিষয় সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ওপর সোপর্দ করা উচিৎ।

১১. কোনো বিষয়ে বর্জন গ্রহণের জন্য অহীর পথ অবলম্বন করতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো বিষয় বিশ্বাস বা সাব্যস্ত করার জন্যও অহীর পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং বিদ‘আতকে প্রতিহত করার জন্য বিদ‘আতের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। আর কোনো বিষয়ের অবজ্ঞা ঠেকাতে অতিরঞ্জন করার মাধ্যমে মোকাবেলা করা যাবে না। অনুরূপ কোনো বিষয়ের অতিরঞ্জন ঠেকাতে অবজ্ঞাও করা যাবে না। (অর্থাৎ যতটুকু শরী‘আত সমর্থন করে ততটুকুই করা যাবে)

১২. দীনের মধ্যে নব সৃষ্ট সব কিছুই বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আতই হলো পথভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণতিই জাহান্নাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ক তাওহীদ (তাওহীদুর রুবুবিয়াহ)

১. আল্লাহ তা‘আলার নাম ও সিফাতের বিষয়ে মূল আকীদা হলো- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে তুলনাহীনভাবে, সেগুলোর কোনো রকম বা ধরন নির্ধারণ না করে তাঁর জন্য তা সাব্যস্ত করা। আর যে সমস্ত নাম বা গুণাবলি আল্লাহ তাঁর জন্য নিষেধ করেছেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও আল্লাহ থেকে যে সমস্ত নাম ও গুণাগুণ নিষেধ করেছেন সেগুলোকে নিষেধ করা বা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করা। এগুলোর কোনো প্রকার বিকৃতি বা এগুলোকে অর্থশূণ্য মনে না করা। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় তিনি সব শুনেন ও দেখেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

তবে কুরআন ও সুন্নাহ’য় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর যে অর্থ আছে সে অর্থের ওপর এবং এগুলোর

যে যে বিষয় প্রমাণ করছে সেসব বিষয়ে পূর্ণ ঈমান থাকতে হবে।

২. আল্লাহর নাম এবং গুণাবলিকে অন্য কিছুর সাথে সদৃশ মনে করা বা এগুলোকে অর্থশূন্য মনে করা কুফুরী।

আর এটাকে বিকৃত করা, যাকে বিদ‘আতী সম্প্রদায় ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করে থাকে। এর কিছু পর্যায় রয়েছে তন্মধ্যে কোনো কোনো বিকৃতি কুফুরীর সমতুল্য। যেমনটি করে থাকে বাতেনিয়া সম্প্রদায়[3], আবার কোনো কোনো বিকৃতি বিদ‘আত ও পথভ্রষ্টতা। যেমনটি আল্লাহর গুণসমূহের অস্বীকারকারীদের ব্যাখ্যা। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা সাধারণ ভুল হিসেবে প্রমাণিত।

---

[3] বাতেনিয়া সম্প্রদায় বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা মনে করে থাকে যে, কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, তাদের নিকট সেগুলোর গোপন অর্থ রয়েছে। তন্মৃধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে আগাখানী ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, কোনো কোনো শিয়া ও সুফী সম্প্রদায়। এরা সবচেয়ে বেশি ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী। তাদের অধিকাংশই কাফির। [সম্পাদক]

৩. ওহদাতুল ওজুদ বা আল্লাহ এবং সৃষ্টিকুল এক অভিন্ন সত্তা হিসেবে বিরাজমান মনে করা অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোনো সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হন অথবা কেউ আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে গেছেন বলে বিশ্বাস করা। এ ধরনের যাবতীয় আকীদা-বিশ্বাস কুফুরী এবং এর ফলে দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

৪. মৌলিকভাবে সকল ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। আর তাদের নাম, গুনাবলি, কাজ ইত্যাদি বিষয় সহীহ দলীল প্রমাণ সহকারে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে এবং যতটুকুর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ততটুকু বিশ্বাস করা।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাবের ওপর ঈমান আনয়ন করা এবং এর ওপরও ঈমান আনয়ন করা যে, ঐ সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন শরীফ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সেগুলোর বিধি-বিধান রহিতকারী। আর এটাও ঈমান রাখা যে, পূর্বতম সমস্ত আসমানী কিতাবে বিকৃতির অনুপ্রবেশে ঘটেছে। আর

এজন্যই কেবল অনুসরণ করতে হবে একমাত্র কুরআনেরই, পূর্বেরগুলোর নয়।

৬. সকল নবী ও রাসূলগণের ওপর ঈমান রাখা এবং মানুষের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। কেউ যদি নবীদের সম্পর্কে এর বিপরীত মত পোষণ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

যে সকল নবীর ব্যাপারে নিদিষ্টভাবে কুরআন বা সহীহ হাদীসে আলোচনা হয়েছে তাদের ওপর নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে। বাকীদের ওপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনতে হবে। আরও ঈমান আনতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের সবার চেয়ে উত্তম এবং তিনি সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ তাঁকে সকল মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন।

৭. ঈমান আনতে হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে অহীর ধারবাহিকতা বন্ধ হয়েছে এবং তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। অতঃপর যে ব্যক্তি এর বিপরীত আকীদা পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

৮. শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনতে হবে। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত সকল সহীহ সংবাদ ও তার পূর্বে যে সমস্ত ‘আলামত বা নিদর্শনাবলী সংগঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও ঈমান রাখতে হবে।

৯. তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান রাখা। আর তা হলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা‘আলা সকল কিছুর অস্তিত্বের পূর্বেই তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তিনি তা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর আল্লাহ যা চান তাই হয়ে থাকে, আর যা চান না, তা হয় না। সুতরাং কেবল আল্লাহ যা চাইবেন তা-ই শুধু হবে। আর আল্লাহ্ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। যা ইচ্ছে তা করেন।

১০. দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক গায়েবের সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে। যেমন, ‘আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের শান্তি ও শাস্তি, পুলসিরাত, মিযান ইত্যাদি। এগুলোতে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

১১. কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবীগণ, ফিরিশতা ও নেককার লোকদের সুপারিশ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা যা বলা হয়েছে তাতে ঈমান আনয়ন করা।

১২. (আরও ঈমান আনতে হবে যে,) কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান ও জান্নাতে সকল মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া হক ও বাস্তব। আর যে তা অস্বীকার করবে অথবা অপব্যাখ্যা করবে সে বক্রপথের অনুসারী এবং পথভ্রষ্ট। তবে দুনিয়াতে কারও পক্ষে দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

১৩. নেক বান্দা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কারামত সত্য। তবে প্রত্যেক আলৌকিক ঘটনাই কারামত নয়, কখনো হতে পারে এটি প্ররোচনা মাত্র। কখনো বা এটি শয়তানের প্রভাবে বা মানুষদের যাদুর প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে। বিশেষ করে এসব বিষয় ও কারামতের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক না হলে সেটাকে কারামত বলা যাবে না।

১৪. প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু। আর প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে এই বেলায়েত বা বন্ধুত্বের পরিমাণ নির্ণিত হবে তার ঈমান অনুযায়ী।

তৃতীয় অধ্যায়

ইচ্ছা বা চাওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়্যা)

১. আল্লাহ এক, একক। তাঁর রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, নামসমূহ এবং গুণসমূহে কোনো শরীক নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের রব এবং যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার তিনিই একমাত্র অধিকারী।

২. দো'আ, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, ত্রাণ চাওয়া, মান্নত, যবেহ, ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা, ভালোবাসা এবং এ রকম সকল ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা শির্ক। যে উদ্দেশ্যেই তা করে থাকুক না কেন, চাই তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতার জন্য করুক বা কোনো নবী-রাসূলের জন্য করুক অথবা কোনো সৎ বান্দার জন্যই হোক বা অন্য কারও জন্য হোক[4]।

৩. ইবাদতের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, ভালোবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা সহকারে আল্লাহর ইবাদাত করা।

---

[4] অর্থাৎ এসবই বড় শির্ক। [সম্পাদক]

এর কোনো অংশ বাদ দিয়ে অপর অংশ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা পথভ্রষ্টতা। কোনো আলেম বলেছেন:

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় না করে বা তার রহমতের আশা না করে শুধুমাত্র তাঁর ভালোবাসায় ইবাদত করে, সে ব্যক্তি যিন্দীক[5] এবং যে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় কিন্তু তাঁকে ভালোবাসে না বা তাঁর রহমতের আশা করে না, সে ব্যক্তি হারুরী[6]। আর যে ভয়-ভীতি ও ভালোবাসা শূন্য হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর ইবাদত করে। সে মুরজিয়া[7] সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

---

[5] যিন্দীক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করে বটে কিন্তু ভেতরগতভাবে কাফের। [অনুবাদক]

[6] হারুরী বলতে খারেজী সাম্প্রদায়কে বুঝায়। যারা কবীরা গোনাহকারীকে কাফের বলে বিশ্বাস করে। [সম্পাদক]

[7] মুরজিয়া হচ্ছে, ঐ সমস্ত লোক, যারা মনে করে যে, ঈমানের পরে আমলের কোনো প্রয়োজন নেই, গোনাহ করলে ঈমানের কোনো সমস্যা হয় না, তারা অপরাধ করতে থাকে আর আশা করতে থাকে যে, সব মাফ হয়ে যাবে। গোনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো ভয় কাজ করে না। [সম্পাদক]

৪. সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা, পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রাপ্য। আর আইন-বিধান প্রদানকারী হিসেবে আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ্‌কে রব ও ইলাহ হিসেবে ঈমান আনয়ন করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান ও নির্দেশ প্রদানে আল্লাহর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। আর যে বিষয়ে আল্লাহর অনুমোদন নেই, সেটাকে বিধান মনে করা বা তাগুত তথা আল্লাহ বিরোধী শক্তির নিকট ফয়সালা চাওয়া অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত ব্যতীত অন্য কোনো শরী'আতের অনুসরণ করা এবং ইসলামী শরী'আতের কোনো প্রকার পরিবর্তন করা কুফুরী। আর কেউ যদি মনে করে যে ইসলামী শরী'আতের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার তার রয়েছে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহর অবতীর্ণ আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন করা বড় কুফুরী। কিন্তু অবস্থার আলোকে কখনো কখনো এটি ছোট কুফুরীর পর্যায়ে পড়বে।

বড় কুফুরী হবে তখন, যখন আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন অবশ্যম্ভাবী করে নিবে অথবা অন্য আইন দিয়ে শাসন করাকে বৈধ করে নিবে।

আর ছোট কুফুরী হবে তখন, যখন আল্লাহর আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনায় প্রবৃত্তির টানে আল্লাহর শরী'আত থেকে সরে এসে অন্য কোনো আইন দিয়ে ফয়সালা করে।

৬. দীনকে হাকীকত ও শরী'আত ভাগ করা এবং মনে করা যে, হাকীকাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে মুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ওলী বুজুর্গগণ, আর শরী'আত শুধু সাধারণ মানুষকেই মানতে হবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তা মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, অনুরূপভাবে, রাজনীতি ও এরূপ অন্যান্য বিষয়কে দীন থেকে বিচ্ছিন্ন করা, এসবই বাতিল-অসার কথা। বরং ইসলামী শরী'আত বিরোধী যাবতীয় হাকীকত অথবা রাজনীতি অথবা অন্য সকল কিছুই অবস্থা ও পর্যায় ভেদে হয় কুফুরী না হয় পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য হবে।

৭. গায়েবের বিষয়াদি শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে এমন ধারণা পোষণ করা কুফুরী, তবে এও ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা অনেক সময় গায়েবসংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁর রাসূলগণকে পরিজ্ঞাত করে থাকেন।

৮. জ্যোতিষ ও গণকদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা কুফুরী এবং কোনো কিছু গণনা বা পরীক্ষার জন্য তাদের নিকট যাওয়া-আসা করা কবীরা গোনাহ।

৯. কুরআন শরীফে যে উসীলা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, ঐ সমস্ত বৈধ ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

উসীলা অবলম্বনের পর্যায় তিনটি:

এক: বৈধ : আর তাহলো আল্লাহ তা‘আলার নামও তাঁর গুণাবলীর মাধ্যমে বা ব্যক্তির নিজের নেক আমলের মাধ্যমে অথবা কোনো নেককার লোক দ্বারা দো‘আ করার মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা।

দুই: বিদ‘আত: আর তাহলো শরী‘আত পরিপন্থি কোনো পদ্ধতিতে উসীলা তালাশ করা। যেমন, নবী-রাসূল বা

নেককার লোকদের সত্তার দোহাই দিয়ে, কিংবা তাদের মহিমা বা সাধুতা, তাদের অধিকার ও তাদের সম্মান ও পবিত্রতার দোহাই দিয়ে উসীলা গ্রহণ করা।

তিন: শির্ক: এর উদাহরণ, যেমন ইবাদতের জন্য মৃতব্যক্তিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা অথবা তাদেরকে আহ্বান করা, ডাকা বা তাদের নিকট প্রয়োজন পূরণ করা চাওয়া এবং সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি।

১০. কোনো কিছু বরকতময় বা মঙ্গলময় হয়ে থাকে আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টিতে বিশেষভাবে বরকত প্রদান করে থাকেন। তবে কোনো কিছুর বরকতময় হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে দলীল প্রমাণের ওপর।

বরকতের অর্থ হলো, কল্যাণ বা মঙ্গলের আধিক্য হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কোনো কিছুতে তা অবশিষ্ট থাকা বা কোনো কিছুতে তার স্থায়িত্ব লাভ।

তন্মধ্যে সময়ে আল্লাহর বরকত। যেমন, কদরের রাত্রি। স্থানের মধ্যে বরকত। যেমন, মাসজিদুল হারাম, মসজিদে

নববী এবং মসজিদে আকসা। বস্তুর মধ্যে বরকত। যেমন, যমযমের পানি। আমল বা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বরকত। যেমন, সকল নেক আমলই বরকতময়। ব্যক্তি সত্তায় বরকত। যেমন, ব্যক্তি হিসেবে সমস্ত নবীদের সত্ত্বা বরকতময়; কিন্তু কোনো ব্যক্তির (সত্তা কিংবা স্মৃতির) নামে বরকত চাওয়া জায়েয নয়, শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্তা বা তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বস্তুসমূহ থেকে তাঁর জীবদ্দশায় বরকত গ্রহণ করা জায়েজ বলে, দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু রাসূলের মৃত্যু ও তাঁর স্মৃতি জড়িত বস্তুসমুহ তিরোহিত হবার পর এ সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল।

১১. বরকত গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ‘তাওকীফী’ বা কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞান লাভের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোনো বস্তু থেকে বরকত নেয়া দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে।

১২. কবর যিয়ারত এবং কবরের নিকট মানুষ যে সকল কাজ করে থাকে, তা তিন প্রকার:

প্রথম: শরী‘আত সম্মত। যেমন, আখেরাতকে স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা এবং কবরবাসীদের ওপর সালাম ও তাদের জন্য দো‘আ করা।

দ্বিতীয়: বিদ‘আত বা অভিনব পন্থায় যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী, যা শির্কের মধ্যে পতিত হওয়ার মাধ্যম। যেমন, আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কবরের কাছে গমন করা অথবা কবর দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্য নেওয়া বা কবরের কাছে সাওয়াব হাদিয়া হিসেবে পেশ করা অথবা কবরের ওপর সৌধ নির্মাণ, কবর বাঁধাই করা, সুসজ্জিত করা ও বাতি দেওয়া অথবা কবরকে মসজিদ বা সালাতের স্থান বানানো কিংবা বিশেষ কোনো কবরকে কেন্দ্র করে ভ্রমন করা ইত্যাদি। কারণ, এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অথবা শরী‘আতে এর কোনো স্থান নেই।

তৃতীয়: শির্কী যা তাওহীদ পরিপন্থি। কবরের নিকট এমন কাজ কর্ম করা যা নির্ভেজাল শির্ক। আর তাওহীদ পরিপন্থী, যেমন কবরস্থ ব্যক্তির জন্য কোনো ইবাদত করা

বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আহ্বান করা, ডাকা এবং কবরস্থ ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বা তার দ্বারা উদ্ধার কামনা করা অথবা কবরের চারপার্শে তাওয়াফ করা অথবা এর জন্য যবেহ করা, একে উদ্দেশ্য করে মানত করা ইত্যাদি।

১৩. "কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত মাধ্যম আছে সে সব মাধ্যমের বিধি-বিধান সে উদ্দিষ্ট বস্তুর বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।" সুতরাং আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক হয় বা আল্লাহর দীনে বিদ'আতের প্রসার ঘটবে এমন যাবতীয় মাধ্যম বন্ধ করা ওয়াজিব। আর দীনের মধ্যে সৃষ্ট অভিনব সকল কাজেই বিদ'আত নিহিত। আর প্রতিটি বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

চতুর্থ অধ্যায়

আল ঈমান

১. ঈমান কথা ও কাজের নাম, যা বাড়ে এবং কমে। অতএব, ঈমান হচ্ছে, অন্তর ও মুখের স্বীকৃতি এবং অন্তর, মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজের নাম।

অন্তরের কথা হলো, বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা।

মুখের কথা হলো, স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তরের কাজ হলো, তা মেনে নেয়া, একনিষ্ঠতা সহকারে করা, এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, ভালবাসা ও সৎ কাজের ইচ্ছা করা।

আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ হলো, আদেশকৃত সকল কাজকে বাস্তবায়িত করা এবং নিষেধকৃত সমস্ত কাজ বর্জন করা।

২. আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের কাজ। আর যে ব্যক্তি ঈমানের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করে নিবে যা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয় সে অবশ্যই বিদ‘আতী।

৩. যে ব্যক্তি "لا اله الا الله" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং محمد رسول الله (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর দুই সাক্ষ্যের মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করবে না, তাকে দুনিয়া বা আখেরাত কোনো অবস্থাতেই ঈমানদার বলা যাবে না।

৪. ইসলাম ও ঈমান দু'টি শর'ঈ পরিভাষা, কখনো কখনো পরিভাষা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো বা একটি অপরটির সম্পূরক, আর কেবলার অনুসারী সকল ব্যক্তিই মুসলিম।

৫. কবীরা গুণাহকারী ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে না। দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাকে দুর্বল ঈমানদার বলা হবে এবং তার আখেরাতের বিষয় আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন বা শাস্তি দিতে পারেন।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী একজন মুমিন গুনাহের কারণে শাস্তি ভোগ করলেও শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের কেউই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না।

৬. নির্দিষ্টভাবে কোনো আহলে কিবলা বা মুসলিমকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। তবে হ্যাঁ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আখ্যায়িত করা যাবে যাদের বিষয় কুরআন ও সুন্নাতে উল্লেখ হয়েছে।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে কুফুরী দুই প্রকার:

এক. বড় কুফুরী। এ ধরনের কুফুরীর কারণে একজন ব্যক্তি দীন থেকে বেরিয়ে যাবে।

দুই: ছোট কুফুরী। এ ধরনের কুফুরীর কারণে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে না, কখনো এই কুফুরীকে আমলী বা কার্যত কুফুরী বলা হয়।

৮. কাউকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করা এমন এক ইসলামী বিধান যার একমাত্র ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং শরী'আতসম্মত কোনো দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কোনো কথা বা কাজের ওপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা জায়েয নয়, এমনকি কোনো কথা বা কাজ কুফুরীর পর্যায় পড়লেও ঐ কারণে যে কাউকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলতেই হবে এমনটি নয়। হ্যাঁ, ঐ পর্যায়ে কাউকে কাফির বলা যেতে পারে

যখন তার মধ্যে কুফুরীর সমস্ত শর্ত পাওয়া যায় এবং তাকে এ নামে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা আছে তার কোনোটি অবশিষ্ট না থাকে। বস্তুত কারও ওপর কুফুরীর হুকুম প্রয়োগ করা খুবই জটিল ও মারাত্মক বিষয়, এ জন্য কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী

১. বর্ণ ও অর্থ উভয়টি মিলেই কুরআন শরীফ আল্লাহর বাণী। এটি আল্লাহর সৃষ্টি নয়, তাঁর থেকেই এর শুরু এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। এটি এক অকাট্য মু'জিযা যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং এই কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

২. আল্লাহ তা'আলা যার সাথে যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন, তাঁর কথা বাস্তব বর্ণ ও আওয়াজের সমন্বয়ে গঠিত; কিন্তু তাঁর কথা বলার ধরন আমাদের জানার বাইরে এবং আমরা এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হব না।

৩. কুরআন শরীফ এক অন্তর্নিহিত ভাবের নাম বা অন্য কিছু থেকে নেওয়া এটি একটি বর্ণনা মাত্র অথবা এটি শুধুমাত্র ভাষা ও বুলির অভিব্যক্তি, কিংবা এটি রূপক বা এটি ফায়েয তথা এক অসাধারণভাবে অন্তরে উদিত হওয়া উৎকর্ষের নাম, কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য

হচ্ছে পথভ্রষ্টতা ও বক্রতা। আবার কখনো এ ধরনের উক্তি কুফুরী।

৪. যে কেউ কুরআনের কোনো কিছুকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করবে অথবা মনে করবে যে, এটি ত্রুটিপূর্ণ বা এতে পরিবর্ধন করা হয়েছে অথবা এতে বিকৃতি আছে, সে কাফির।

৫. সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী সঠিক তাবে'ঈগণ যে পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতেই এর ব্যাখ্যা করা কতর্ব্য। শুধু নিজের মতামতের ওপর ভিত্তি করে কুরআনের ব্যাখ্যা না জায়েয। কেননা তখন তা হবে, না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা। আর বাতেনিয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো কুরআনের ব্যাখ্যা করা কুফুরী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত-তাকদীর

১. ঈমানের স্তম্ভগুলোর অন্যতম একটি স্তম্ভ তাকদীরের ভালো-মন্দ আল্লাহর হাতে এ ঈমান পোষণ করা। এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হচ্ছে,

তাকদীর সম্পর্কিত কুরআন সুন্নায় যা এসেছে সেসব কথায় ঈমান আনতে হবে, (সেগুলো হলো: আল্লাহর জ্ঞান, লিখন, ইচ্ছা, সৃষ্টি) এবং ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার মতো কোনো শক্তি নেই এবং তাঁর বিধানকে রদ করার কোনো অধিকার কারও নেই।

২. কুরআন সুন্নায় বর্ণিত ইরাদা বা ইচ্ছা ও আদেশ দুই প্রকার:

(ক) পূর্বাহ্নেই স্থিরকৃত আল্লাহর সৃষ্টিগত ইরাদা বা ইচ্ছা। (মাশীয়াহ বা চরম ইচ্ছা অর্থে) যে নির্দেশ তার স্থিরিকৃত ও সৃষ্টিগত এবং তাকদীরের নির্ধারণ অনুযায়ী।

(খ) আল্লাহর শরী'আতসম্মত ইরাদা বা ইচ্ছা। (যে নির্দেশের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অপরিহার্য) যে নির্দেশটি তিনি শরী'আত হিসেবে প্রদান করেন।

আল্লাহর সৃষ্টিজীবদেরও ইচ্ছা এবং চাওয়া রয়েছে তবে সে সমস্ত ইরাদা বা ইচ্ছা আল্লাহর ইরাদা বা ইচ্ছার অনুগত।

৩. কোনো ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করা বা পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তাদের মধ্যে যাকে তিনি হিদায়াত দান করেছেন, তা তাঁর একান্ত অনুগ্রহেই দান করেছেন। আর যার ওপর পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে তাও তার প্রতি আল্লাহর ন্যায় বিচার।

৪. সৃষ্ট জীব ও তাদের কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, অন্য কেউ-ই এটির স্রষ্টা নন। সুতরাং আল্লাহই বান্দার কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা। আর সৃষ্টিজগতও প্রকৃত অর্থেই সেগুলো কার্যে পরিণত করে থাকে।

৫. আল্লাহর সকল কাজের পেছনে যে হেকমত নিহিত আছে এটিকে সাব্যস্ত করতে হবে। আরও সাব্যস্ত করতে হবে যে, সমস্ত উপায় উপাদানের প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

৬. মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ মানুষের হায়াতের সময় নির্ধারণ করেছেন, রিযিক বণ্টন করেছেন। আর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এ দু'টিও তিনি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৭. বিপদ ও কষ্টের বিষয়ে তাকদীরের যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু পাপ কাজের বিষয়ে তাকদীরের যুক্তি দেখানো ঠিক নয়, কেউ এমনটি করলে তাকে তাওবা করতে হবে এবং এজন্য তাকে তিরস্কার করা হবে।

৮. দুনিয়াতে চলার জন্য যে সমস্ত উপায় উপাদানের প্রয়োজন এ সবের ওপর নির্ভর করার অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, অপরদিকে দুনিয়ার আসবাব বা উপায় উপাদান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো, ইসলামী শরী'আতকে কলঙ্কিত করা। বস্তু ও উপায় উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা শরী'আত ও বুদ্ধি-বিবেক পরিপন্থি। আর আল্লাহর ওপর ভরসার অর্থ এই নয় যে, কোনো প্রকার উপায় উপাদান অবলম্বন করা যাবে না।

সপ্তম অধ্যায়

আল জামা‘আত ও আল ইমামত

(সংঘবদ্ধ জীবন ও নেতৃত্ব)

১. এখানে জামা‘আত বলতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের বুঝান হয়েছে এবং এই দলই হলো পরিত্রাণপ্রাপ্ত দল, যে ব্যক্তি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তিও ঐ জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও কোনো ছোট-খাট বিষয়ে ভুল-ক্রটি করে।

২. দীনের মধ্যে বিভেদ বা দলাদলি ও মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে কুরআন, সুন্নাহ ও আমাদের সালাফে সালেহীন তথা সঠিক পথের পূর্বসূরীদের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা কর্তব্য।

৩. জামা‘আত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং এর প্রতি আহ্বান করা উচিৎ। এছাড়া তাঁর সাথে সুন্দর পন্থায় বুঝাপড়া করা এবং কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে তা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া কর্তব্য। এরপর তাওবা করে ফিরে

আসলে তো ভালোই নচেৎ শরী'আতের বিধানে যে শাস্তি ভোগ করা দরকার তাই করবে।

৪. কুরআন, হাদীস ও সুস্পষ্ট ইজমা'র ভিত্তিতে সাব্যস্ত বিষয়াদিতেই কেবল মানুষদের চলতে বাধ্য করতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষকে তাত্বিক ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করা অবৈধ।

৫. সকল মুসলিমের ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে যে, তারা সঠিক উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসে রয়েছেন। যতক্ষণ না তাদের থেকে এর বিপরীত কোনো কাজ পরিলক্ষিত না হয়। অনুরূপভাবে সকল সাধারণ মানুষের কথার ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে, তাদের কথাকে উত্তম অর্থে গ্রহণ করা। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যার অবাধ্যতা ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যাবে, তা ধামা-চাপা দেওয়ার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না।

৬. কিবলার অনুসারী কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ'র পরিপন্থী সকল ফির্কা বা দলই ধ্বংস ও জাহান্নামের শাস্তির হুমকিপ্রাপ্ত। তাদের ও অন্যান্য শাস্তির সংবাদপ্রাপ্তদের একই হুকুম। তবে কোনো ব্যক্তি যদি বাহ্যিকভাবে

মুসলিম কিন্তু ভেতরগতভাবে কুফুরী করে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন।

আর ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া সকল ফির্কা সার্বিকভাবে কাফির, তাদের ও ধর্ম-ত্যাগী মুরতাদদের বিধান একই।

৭. জুমু‘আর সালাত এবং জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় ইসলামের প্রকাশ্য বড় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো মুসলিমের ব্যক্তিগত অবস্থা না জেনে তার পেছনে সালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে এবং কারো ব্যক্তিগত অবস্থা না জানার দোহাই দিয়ে তার পেছনে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা বিদ‘আত।

৮. কোনো ব্যক্তির বিদ‘আত বা অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়লে এবং এমতাবস্থায় অন্য কারো পেছনে সালাত আদায় করার সুযোগ থাকলে ঐ ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করা অনুচিত, তবে যদি সালাত আদায় করে ফেলা হয় তাহলে সালাত হয়ে যাবে, কিন্তু মুক্তাদী এ কারণে গুণাহগার হবে। তবে যদি বড় ধরনের কোনো ফিতনা ঠেকাবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করে, সেটা ভিন্ন কথা।

আর যদি অন্য ইমামও এই বিদ‘আতী ইমামের অনুরূপ হয় অথবা তার চাইতে আরো খারাপ হয়, তবে ঐ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা জায়েয হবে এবং এ অজুহাতে জামা‘আত ত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তির ওপর কুফুরীর হুকুম দেওয়া হলে কোনো অবস্থাতেই তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে না।

৯. রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে উম্মতের ঐক্যের ভিত্তিতে অথবা দেশের ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষমতা রাখেন এমন গ্রহণযোগ্য (প্রধান প্রধান আলিম ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য দায়িত্ববান) ব্যক্তিদের বাই‘আত গ্রহণ করার মাধ্যমে। যদি কেউ জোর করে ক্ষমতা দখল করে, এরপর জনগণ যদি তার শাসন মেনে নেয় তাহলে সৎভাবে তার আনুগত্য করা, তাকে সৎ উপদেশ দেওয়া সকলের ওপর ওয়াজিব এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। একমাত্র তখনই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে যখন তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফুরী পরিলক্ষিত হবে, যে কুফুরীর ব্যাপারে তোমাদের নিকট প্রমাণ রয়েছে।

১০. মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্যায়মূলক কোনো আচরণ করলেও তাদের পেছনে সালাত আদায় করা বা তাদের সাথে হজ করা এবং তাদের নেতৃত্বে জিহাদ করা কর্তব্য।

১১. পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করা হারাম। মূর্খতামূলক জেদা-জেদি করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র যুদ্ধ করা জায়েয বিদ'আতী, সীমালঙ্ঘনকারী এবং এদের মতো অন্যান্যদের সাথে, যদিও যুদ্ধ ছাড়া এর থেকে স্বল্প কিছু দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়। আবার কখনও কখনও অবস্থা ও স্বার্থ পর্যালোচনা করার পর এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্যও হয়ে যাবে।

১২. সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ এবং মুসলিম উম্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও ফযীলতের স্বাক্ষ্য দেওয়া একটি অকাট্য মূলনীতি ও দীনের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। আর তাদেরকে মহব্বত করা দীন ও ঈমানের দাবী। তাদের

সাথে শত্রুতা করা কুফুরী ও মুনাফেকী। তাদের মাঝে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মতবিরোধ বা বিবাদ হয়েছে তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। তাদের সম্মানের ক্ষতিকর বিষয় আলোচনা পরিত্যাগ করা বাঞ্চনীয়।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যথাক্রমে আবূ বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং এই চার জনকেই বলা হয় খোলাফায়ে রাশেদা, ক্রমানুসারে তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩. প্রত্যেক মুসলিমের নিকট দীনের অন্যতম আরো একটি দাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজনকে ভালোবাসা এবং তাদেরকে আপন মনে করা এবং তাদের স্ত্রীদের সম্মান ও তাদের মর্যাদা অনুধাবন করা। দীনের আরো দাবী সমস্ত সাহাবী, তাবে‘ঈ ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী সকল আলিমদের ভালোবাসা এবং বিদ‘আতী ও বুপ্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

১৪. আল্লাহর পথে জিহাদ করা ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদ চলতেই থাকবে।

১৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন এবং ইসলামী জামা'আতকে টিকিয়ে রাখার এটি একটি উত্তম হাতিয়ার, সমর্থ অনুযায়ী এ কাজ করা সকল মুসলিমের ওপর কর্তব্য এবং স্বার্থ ও অবস্থার আলোকে এ দায়িত্বকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তার পরিচয়

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতকে পরিত্রাণপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলও বলা হয়। এ জামা‘আতের লোকদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে তাদের কিছু নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে তা বর্ণিত হলো:

১. **আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান:** তারা কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্যদিয়ে এটির গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসকে জেনে-বুঝে এবং সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে চিহ্নিত করে হাদীসের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। (এর কারণ হলো, কুরআন ও সুন্নাহই তাদের জ্ঞানের মুল উৎস) এছাড়া তারা জ্ঞান অর্জন করে তা আমলে পরিণত করেন।

২. **পরিপূর্ণভাবে দীনের মধ্যে প্রবেশ করা:** পুরো কুরআনের ওপর বিশ্বাস করা। সুতরাং তারা কুরআনে আলোচিত ভালো ওয়াদা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এবং

শাস্তির হুমকি সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে। যেমনিভাবে তারা আল্লাহর গুণাগুণ সাব্যস্ত আয়াতসমূহে ঈমান ও যে সমস্ত গুণাগুণ থেকে আল্লাহ্ পবিত্র সেগুলো যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাতেও ঈমান রাখেন। আর তারা তারা সমন্বয় সাধন করেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীরে ঈমান আনয়নের পাশাপাশি বান্দার জন্য ইচ্ছা, চাওয়া ও কার্যক্ষমতা সাব্যস্ত করেন। অনুরূপভাবে তারা সমন্বয় বজায় রাখেন ইলম ও ইবাদতে, শক্তি ও রহমতে, উপায় অবলম্বন করে কাজ করা ও পরহেযগারী করে দুনিয়া বিমুখতায়।

৩. **অনুসরণ করা ও বিদ‘আত পরিত্যাগ করা:** তারা অনুসরণ করেন এবং বিদ‘আতকে পরিহার করেন, সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করেন এবং দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল পথ বর্জন করেন।

৪. হিদায়াতের ন্যায়পরায়ণ ইমামদের অনুকরণ, অনুসরণ: তারা হিদায়াত পাওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যারা ছিলেন ইলম, আমল ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়

ব্যক্তিত্ব এমন হিদায়াতের ধারক ও বাহক ইমামদের পথ অনুসরণ করেন এবং যারা উক্ত ইমামদের বিরোধিতা করে তাদেরকে পরিহার করেন।

৫. তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী: অর্থাৎ আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে না তারা অতিরঞ্জিতকারীদের মতো, না এ বিষয়কে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা পোষণকারীদের মতো। এভাবে সমস্ত কাজকর্ম এবং আচার ব্যবহারে তারা বাড়াবাড়ি ও কমতি এ দু'য়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী।

৬. **সব সময় তারা মুসলিমদের সত্য পথে একত্রিত করতে সচেষ্ট থাকে।** আর তারা (আল্লাহর) তাওহীদ ও (রাসূলের) অনুসরণের ওপর মুসলিমদের সকল কাতার একত্রিত করার জন্য এবং তাদের মাঝে অনৈক্যসৃষ্টিকারী সকল কিছুকে দূরীভূত করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

কাজেই দীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য শুধু সুন্নাত ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম ও সুন্নাতের ভিত্তিতেই শত্রুতা বা বন্ধুত্ব করেন।

৭. তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জন্য রাসূলের সুন্নাতকে জীবিত করেন, বিদ'আতকে দূর করেন। আর তারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা: তারা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠিস্বার্থের চাইতে আল্লাহর অধিকারকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তারা না কারো ভালোবাসায় অতিরঞ্জিত করেন এবং না কারো শত্রুতায় সীমালঙ্গন করতঃ তাদের সাথে অশুভ আচরণ করেন এবং না কোনো মহৎ ব্যক্তির মহত্বকে অস্বীকার করেন।

৯. **জ্ঞান আহরণের মূল উৎস কুরআন সুন্নাহ হওয়ার কারণে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেক অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে,** যদিও তাদের যুগ বা ভূখণ্ড ভিন্ন হোক।

১০. সকল মানুষের সাথে অনুগ্রহ, দয়া এবং উত্তম আচরণ করা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. আল্লাহ, তাঁর কিতাব আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলিমদের নেতাগণ এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য নসীহত[৪] করাও তাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. মুসলিমদের সমস্যাদির গুরুত্ব দেওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাও তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অশেষ মেহেরবাণীতে এই ক্ষুদ্র কাজটি সমাপ্ত হলো।

---

[৪] আল্লাহর জন্য নসীহতের অর্থ হলো, তাঁর জন্য শির্ক মুক্ত ইবাদত করা, তাঁর নাম ও গুণবাচক নামসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখা, কুরআনের জন্য নসীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা, রাসূলের জন্য নসীহতের অর্থ- তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর দেওয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা।